ইকুইটিবিডি অবস্থানপত্র, জুন ২৪, ২০২০ ----- (খসড়া)

ব্যয় মেটাতে শুধু রাজস্ব আদায় ও ব্যাংক ঋণের উপর নির্ভরশীলতা নয়

রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে অর্থ পাচার রোধ হোক সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

ক. আভ্যন্তরিন রাজস্ব আদায়, বাজেট ঘাটতি ও করোনা প্রভাব

মহামারী করোনাভাইরাসের কারনে শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অর্থনীতি আজ বিপর্যস্থ, যার ক্ষত শুকাতে এক দশকও লেগে যেতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এরকম পারিস্থিতিতে সরকার আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট ঘোষনা করেছে, যা চলতি ২০১৯-২০ বছরের সংশোধিত বাজেটের ১৩% বেশি। রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩ লাখ ৭৮ হাজার ৩ কোটি টাকা যা চলতি অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৯% বেশি এবং মোট বাজটের ৬৭%। বাজেট ঘাটতি রয়েছে প্রায় ১ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা যা মোট জিডিপির ৫.৮%। এই ঘাটতি মোকাবেলার জন্য সরকারকে রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি ব্যাপকভাবে ব্যাংক ঋনের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

নতুন বছরে ব্যাংক ঋনের পরিমান ১ লাখ ৯৮ হাজার ৮০৭ কোটি টাকা যা চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের চেয়ে ৩২% বেশি এবং প্রস্তাবিত বাজেটের ৩৫%। এই ব্যাংক ঋণের মধ্যে অভ্যন্তরিন ঋণ হচ্ছে ১লাখ ৯ হাজার ৯৮৩ কোটি টাকা যা মোট ঋণের ৫৫%। প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৫৬,৯০০ কোটি টাকা অভ্যন্তরিন (৫২,৩৫৫ কোটি) ও বৈদেশিক (৪,৫৫৪ কোটি) ঋনের সুদ পরিশোধ করতে হয়। সরকারকে নতুন বছরে ৬৩,৮০১ কোটি টাকা সুদ পরিশোধ করতে হবে যা মোট বাজেটের প্রায় ১১%। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির মতে দেশের মাথাপিছু ঋণ ৭৯,০০০ টাকা যা গত জুন ২০১৯ শেষে ছিল ৬৭,২৩৩ টাকা, অর্থাৎ মাথাপিছু ঋণ বাড়ছে [*দৈনিক সিলেট মিরর, ০৮-০৬-২০২০*]।

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে দেশের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সঙ্কট উত্তরণে বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করেছেন। তারমধ্যে ৫০ হাজার কোটি টাকা ঋণ হিসেবে বড়-ছোট শিল্পকারখানা, ও সেবাখাতসহ অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হবে এবং এর ফলে ব্যাংক গুলোকে তারল্য সংকটের মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কারন সয়ং সরকারকে নতুন বছরের ব্যয় মেটানোর জন্য ব্যপক হারে ব্যাংক ঋনের উপর নির্ভর করতে হবে। ৫০ হাজার কোটি টাকার জন্য সরকার ১ বছরে ভর্তুকি দিবে প্রায় ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। [Business Standard, ২২/০৬/২০২০]

খ. প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব আদায় কতটুক অর্জন হবে ?

চলতি অর্থবছরে (২০১৯-২০২০) করখাতে মোট রাজস্ব আয়ের লক্ষ্য ধরা হয়েছে ৩ লাখ ৪০ হাজার ১০০ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) আদায় করা সম্ভব হয়েছে ১ লাখ ৭৩ হাজার কোটি টাকা যা লক্ষমাত্রার ৫১%। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাকী দুই মাসে অবশিষ্ট রাজস্ব ১লাখ ৬২ হাজার ১০০কোটি টাকা (লক্ষমাত্রার ৪৯%) আদায় করা সম্ভব কিনা ? আমরা মনে করি তা কোনভাবেই সম্ভব নয় এবং করোনা পরিস্থিতির কারনে করপোরেট ও ব্যক্তি পর্যায়ে আয়কর সংগ্রহ ও শুল্ক আদায় অনেকাংশে হ্রাস পাবে। কারণ এর কারণে দেশব্যাপী টানা দুই মাস দোকান-পাট-অফিসসহ সমস্ত বাণিজ্যিক কার্যক্রম প্রায় বন্ধ ছিল। এই পরিস্থিতিতে মে-জুন মাসে রাজস্ব আদায় বড়জোড় ৫০ থেকে ৬০ হাজার কোটি টাকা হতে পারে। যেক্ষেত্রে রাজস্ব ঘাটতি বছর শেষে ১ লাখ কোটি টাকারও বেশি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিবছর সরকার রাজস্ব আদায়ের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করে থাকে তা কখনও অর্জন করতে পারেনা। যেমন, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেটে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২লাখ ৯৬ হাজার ২০১ কোটি টাকা, কিন্তু আদায় হয়েছে ২লাখ ২৫ হাজার ৯১৯ কোটি টাকা অর্থাৎ ৭৬% এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেটে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২লাখ ৪৮ হাজার ১৯০ কোটি টাকা, কিন্তু আদায় হয়েছে ১লাখ ৯৬ হাজার ৪২৫ কোটি টাকা অর্থাৎ ৭৯%।

বাজেটে মোট উন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে ২ লাখ ১৫ হাজার ৪৩ কোটি টাকা এবং সরকারি পরিচালন ব্যয় ধরা হয়েছে ৩ লাখ ৪৮ হাজার ১৮০ কোটি টাকা, যা মোট উন্নয়ন ব্যয়ের বরাদ্ধ হতে ৬২% বেশি এবং চলতি বছর পরিচালন ব্যয় বাজেট হতে ১৮% বেশি। একদিকে মহামারী করোনাভাইরাসের কারনে সরকার কাম্য রাজস্ব আদায় করতে পারছেনা এবং ব্যাপক হারে ব্যাংক ঋণের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। অন্যদিকে ফি-বছর পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, সরকারের উচিত সরকারি পরিচালন ব্যয় পুন:পর্যলোচনা করে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বন্ধ করে কিছুটা হলেও রাজস্ব ঘাটতি মোকাবেলা করা।

গ. বাজেটে কালো টাকা সাদা করার প্রস্তাবনা কতটা কার্যকর ?

প্রস্তাবিত বাজেটে কালো টাকা সাদা করার যে সুযোগ দেয়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতির পরিপন্থী। এবারই বিনা প্রশ্নে কেবল ১০% হারে কর দিয়ে ফ্ল্যাটের পাশাপাশি জমি কেনা ও শেয়ার বাজারে কালো টাকা বিনিয়োগের সুবিধা দেয়া হয়েছে যার ফলে সৎ করদাতাগন কর প্রদানে নিরুৎসাহিত হবেন। অতীতেও কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়া হলেও খুব কম টাকাই সাদা হয়। স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত মোট ১৬ বার কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়া হয়েছে এবং এ পর্যন্ত মোট ১৪,০০০ কোটি টাকা সাদা হয়েছে যা নতুন বাজেটে মোট রাজস্ব আদায় লক্ষমাত্রার মাত্র ৪%। তাছাড়া করোনার কারনে মানুষের আয় কমে যাওয়ায় মানুষ তাদের সঞ্চয় ভাঙ্গা শুরু করেছে, তাই এই কালো টাকা কতটুকুইবা সাদা হবে তার প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

ঘ. অপ্রদর্শিত অর্থনীতি অভ্যন্তরিন সম্পদ সংগ্রহে বড় বাধা

বাংলাদেশে রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাপনার অন্যতম দুর্বল ভিত্তি হচ্ছে অপ্রদর্শিত অর্থনীতি বা কালো টাকা যার সম্ভাব্য পরিমাণ জিডিপি'র ৪৮% হতে ৮৪% পর্যন্ত এবং এ গড় হিসেবে চলতি অর্থবছরে সম্ভাব্য কালো অর্থনীতির (জিডিপি হিসেবে) পরিমাণ প্রায় ১৮লাখ কোটি টাকা এবং যা চলতি অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটের ৩ গুনেরও বেশি। ব্যয় মেটানোর জন্য যেহেতু সরকারকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায় ও ব্যাংক ঋণের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে এবং অন্যদিকে কাম্য রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হচ্ছেনা, পাশাপাশি খেলাপী ঋনের পরিমান ও মন্দঋন পুনর্তফসিল বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেহেতু সরকাকে অর্থপাচার বন্ধ ও কালো টাকা আদায়ে তৎপর হতে হবে এতে করে বিপুল পরিমান রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হবে।

ঙ. অর্থ পাচার রোধ আমরা কতটুকু বন্ধ করতে পেরেছি ?

Global Financial Integrity (GFI) এর মার্চ ২০২০ এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০০৮ থেকে ২০১৪- এই সাত বছরে আমদানি-রপ্তানির সময়ে পণ্যের প্রকৃত মূল্য গোপন, বিল কারচুপি, ঘুষ, দুর্নীতি, আয়কর গোপন ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাচার হয়েছে ৪,৪৮,২৫৬ কোটি টাকা (৫,২৭৩কোটি ৬০লাখ ডলার) - অর্থাৎ প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৬৪,০০০ কোটি টাকা। উক্ত টাকা ২টি পদ্মা সেতু বা ২টি মেট্রোরেল বা

২বছরের স্বাস্থ্য খাতের বাজেটেরও বেশি। দুদক এর মতে বিদেশে পাচার করা অর্থের ৮০ শতাংশই হয়ে থাকে আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের আড়ালে। *[যুগান্তর: ০৪/০৩/২০২০]*।

সাল/বছর	পাচারকৃত অর্থ
২০০৮	৫২৮ কোটি ডলার
২০০৯	৪৯০ কোটি ডলার
২০১০	৭০৯ কোটি ডলার
২০১১	৮০০ কোটি ডলার
২০১২	৭১২ কোটি ডলার
২০১৩	৮৮২ কোটি ডলার
২০১৫	১,১৫১ কোটি ৩০ লাখ ডলার

জিএফআই-কে ২০১৪, ২০১৬ ও ২০১৭ সালের তথ্য-উপাত্ত দেওয়া

যুক্তরাজ্য ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'ট্যাক্স জাস্টিস নেটওয়ার্ক' Financial Secrecy Index (FSI)-২০২০ নামে প্রতিবেদনে বলা হয়, আর্থিক গোপনীয়তা রক্ষায় শীর্ষ ১০টি দেশ হচ্ছে কেইম্যান দ্বীপপুঞ্জ, ইউএসএ, সুইজারল্যান্ড, হংকং, সিংগাপুও, লুক্সেমবার্গ, জাপান, নেদারল্যান্ডস, ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ ও সংযুক্ত আরব আমিরাত । এসকল দেশ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বৈদেশিক অনুদানের নামে বছরে ১৩৫বিলিয়ন ডলার প্রদান করলেও ১-১.৬ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ অবৈধ ভাবে নিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ তারা প্রতি ১ ডলার অনুদানের বিপরীতে ১০ডলার আদায় করে নিচ্ছে অনৈতিক অর্থ প্রবাহের মাধ্যমে। উন্নত বিশ্বের আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুলো এ ধরনের অর্থ পাচারে উৎসাহিত করে থাকে। এর ফলে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ গুলো বিপুল রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যা দেশগুলোর অর্থনীতিকে দূর্বল এবং ঋণগ্রস্ত করে তুলছে। ১৯৭০ সালের পর থেকে শুধুমাত্র আফ্রিকা থেকে ১ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ পাচার হয়েছে (১ট্রিলিয়ন = ১লক্ষ কোটি) এবং এর বিপরীতে অঞ্চলটির মোট ঋণের পরিমাণ ২০০ বিলিয়ন ডলার (১বিলিয়ন = ১০০কোটি), যা ঐ পাচারকৃত অর্থের কাছে খুবই নগন্ন এবং বছরে গড়ে প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলার অর্থ পাচার হয়। ঠিক একইভাবে বাংলাদেশ থেকেও অবৈধভাবে কর স্বর্গরাজ্য দেশসমূহে অর্থ পাচার হচ্ছে।

- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, সুইজারল্যান্ড সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সিকদার পরিবারের রয়েছে একাধিক কোম্পানি, হোটেল ও টেলিভিশন চ্যানেল। বাংলাদেশ ব্যাংক যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে বিদেশে বিনিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে তার মধ্যে সিকদার গ্রুপের নাম নেই [প্রথম আলো ০৯/০৬/২০২০]।
- গার্মেন্ট মালিকরা তাদের সুবিধা আদায়ে সরকারের সঙ্গে শুধু দরকষাকষিই নয়, তারা ব্যাক টু ব্যাক এলসির মাধ্যমে এবং মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসার আড়ালে অর্থ পাচার করছে। এতে করে জনগণের দেওয়া করের ৩৬ শতাংশ পরিমাণ টাকাই পাচার হয়ে যাচ্ছে। অর্থ পাচারের সঙ্গে তৈরি পোশাক ব্যবসায়ীরাও জড়িত বলে বৈঠকে আলোচনা হয়। এ প্রসঙ্গে এনবিআর চেয়ারম্যান জানান, একজন গার্মেন্ট ব্যবসায়ী ২৯৭ কনটেইনার পণ্য রপ্তানি করেছেন, কিন্তু তার বিপরীতে এক ডলারও বাংলাদেশে আসেনি। *[বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৪/০৬/২০২০, ২৯/০৯/২০১৬]*।
- **মালয়েশিয়ায় ২০০২ সালে "মাই সেকেন্ড হোম প্রোগ্রাম"** চালুর পর থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ জুন পর্যন্ত মোট ৩,৯৪৪ জন বাংলাদেশী "সেকেন্ড হোম" সুবিধা নিয়েছে এবং পাচারের ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৩য়। অথচ গত ১০ বছরে মালয়েশিয়ায় বিনিয়োগের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাউকে কোনো অনুমোদন দেয়নি। কাজেই বুঝা যায় এই টাকা পাচার হয়েছে *[যুগান্তর: ০৪/০৩/২০২০]*।
- **কানাডার 'বেগমপাড়ায়'** বাংলাদেশের অনেক ধনী ব্যক্তি নাগরিকত্ব কিনে তাদের বেগম, ছেলেমেয়ে ও বাড়ি-সম্পত্তিসহ সেখানে রেখে দিয়েছেন। বাংলাদেশ হতে ১৯৭৬ থেকে ২০১০ পর্যন্ত ঐ দেশে অর্থ পাচার হয়েছে প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা *[প্রথম আলো: ২৬/০৫/২০১৩]*। তাছাড়া 'ব্যাংকের টাকা মেরে কানাডায় পাড়ি দিয়েছেন প্রশান্ত কুমার হালদার (৩৫০০ কোটি টাকা), ব্যবসায়ী গাজী বেলায়েত হোসেন মিঠু (৩০০ কোটি টাকা) সহ আরো অনেকে *[দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭/০১/২০২০]*।
- **নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকা ও ফরেষ্ট হিলস** এলাকায় প্রায় ২ মিলিয়ন ডলার নগদ পরিশোধে তিনটি বাড়ির মালিক হয়েছেন জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনের একজন ইকনোমিক মিনিস্টারের স্ত্রী । *[বিডি-প্রতিদিন: ১১/০২/২০১৬]*
- পানামা পেপারস কেলেঙ্কারির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী অর্থ পাচারের যে ১ কোটি ১৫ লাখ নথি প্রকাশ করা হয়, তাতে অন্তর্ভুক্ত ৪৩ জন বাংলাদেশির নাম পাওয়া গেছে, যারা প্রাথমিকভাবে কর ফাঁকি দিয়ে বিদেশে বেনামি প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রমাণ মিলেছে। মোসাক ফনসেকা নামক আইনি প্রতিষ্ঠানটি নির্দিষ্ট ফি নেয়ার মাধ্যমে মক্কেলদের বেনামে বিভিন্ন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সহায়তা প্রদান করে। এর মাধ্যমে তারা সম্পদ গোপন এবং কর ফাঁকি দিয়ে ওই অপ্রদর্শিত আয়কে বৈধ উপায়ে ব্যবহারের সুযোগ পান। *[বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৯/০৯/২০১৬]*

চ. কালো টাকা পাচার রোধে ভারত কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপঃ

১. অপ্রদর্শিত অর্থনীতির উপর শ্বেতপত্র প্রকাশ:

২০১২ সালের মে মাসে ভারত সরকার অপ্রদর্শিত অর্থনীতির উপর শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। ভারত আন্ত:দেশ ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য ৮৮টি দেশের সাথে DTAAs (Double Taxation Avoidance Agreement) চুক্তি সম্পাদন করেছে এবং তথ্যের আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ২২টি দেশের সাথে TIEAs (Tax Information Exchange Agreement) চুক্তি সম্পাদন সম্পাদন করেছে। এর ফলে ভারত ২০০২-২০১২ এই ১০বছরে পাচারকৃত অর্থের মধ্যে প্রায় ১১৭ হাজার কোটি রুপি রাজস্ব আদায় করে।

ভারত সরকার সুইস ব্যাংকগুলোতে তার নাগরিকদের কর্তৃক অর্থ পাচার প্রতিরোধের লক্ষ্যে সুইস সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছে। যার মাধ্যমে সুইস ব্যাংকে অর্থ জমাকারী ভারতীয়দের সম্পর্কে ভারত চাইলে সুইজারল্যান্ডে থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। বাংলাদেশ এ ধরনের চুক্তির সুযোগ নিতে পারেনি। ২০০৭ সালে সুইজারল্যান্ডের সাথে বাংলাদেশের একটি 'ডাবল ট্যাক্স ট্রিটি' চুক্তি হয়। সুইজারল্যান্ড এটি অনুমোদন করতে দুই বছর সময় নেয়। এই চুক্তির মাধ্যমে কোনও নাগরিক কর ফাঁকি দিয়ে সুইজারল্যান্ডের কোনও ব্যাংকে টাকা জমা করেছে সন্দেহ করলে সরকার তার ব্যাংক একাউন্ট সম্পর্কে সকল তথ্য চাইতে পারতো। কিন্তু বাংলাদেশের সরকার চুক্তিতে এ ধরনের কোনও ধারা রাখার ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়নি। ভারতসহ অন্য অনেক দেশ এ সুযোগ গ্রহণ করলেও বাংলাদেশ এটা এড়িয়ে যায় এবং গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯ সালে সুইজারল্যান্ডের অর্থমন্ত্রী একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য প্রকাশ করে।

বছর	রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ (রুপি)
২০০২-০৩	১,৩৫৬ কোটি
২০০৩-০৪	১,২৯০ কোটি
২০০৪-০৫	৪,৪১৮ কোটি
২০০৫-০৬	৮,০৪৯ কোটি
২০০৬-০৭	৯,১৪৭ কোটি
২০০৭-০৮	১১,৭৯০ কোটি
২০০৮-০৯	১৫,৭৪০ কোটি
২০০৯-১০	১৬,১৯৮ কোটি
২০১০-১১	২১,৫০৯ কোটি
২০১১-১২	২৭,৪৪২ কোটি

সুত্রঃ White paper on Black money, India 2012

ভারতের বর্তমান সরকার কালো টাকা তদন্তে বিশেষ তদন্ত দল (এসআইটি) গঠন করেছে। ভারত এবং সুইস সরকারের মধ্যে কর সংক্রান্ত চুক্তি অনুমোদন হওয়ায় সুইস সরকার ভারত সরকারকে যেসকল

ভারতীয়রা কর ফাঁকি এবং কর প্রতারণার মাধ্যমে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার অবৈধ অর্থ গচ্ছিত রেখেছে, সে সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্তি ও তা উদ্ধারে সহায়তা দেবে।

২. বিদেশে পাচারকৃত কালো টাকা সংক্রান্ত আইনী পদক্ষেপঃ

বিদেশে অর্থ পাচার প্রতিরোধে ভারত সরকার একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করেছে। এই আইনটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো:

- বৈদেশিক সম্পদের ক্ষেত্রে আয় এবং সম্পদের তথ্য গোপন ও কর ফাঁকি দিলে ১০ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান
- এই ধরনের অপরাধ মীমাংসার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অভিযোগ মীমাংসার জন্য Settlement Commission এর কাছে যেতে পারবেন না।
- আয় বা সম্পদের তথ্য গোপন করলে আয় বা সম্পদের উপর ৩০০% কর আরোপ করা হবে।
- আয়কর রিটার্ন জমা না দিলে বা এতে বৈদেশিক সম্পদ সম্পর্কে ভুল তথ্য দিলে ৭বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান

৩. অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কালো টাকা প্রতিরোধে আইনী পদক্ষেপঃ

দেশের ভিতরে কালো টাকার বিস্তার প্রতিরোধে বেনামী লেনদেন নিষিদ্ধন বিল নামে একটি আইন পাশ হয়েছে এবং তা হলো,

- সরকার ধারণা করছে যে, এই আইন বেনামী সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার মাধ্যমে, বিশেষ করে আবাসন খাতে বেনামী সম্পদের মাধ্যমে কালো টাকা অর্জনের একটি বড় পথ বন্ধ করা সম্ভব হবে। মূল মালিকের পরিবর্তে অন্য আরেকজনের নামে সম্পদ করা বা রাখাকেই বেনামী সম্পদ হিসেবে অভিহিত করা হবে এবং এসব সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার কথা বলা হয়েছে।
- ২০০০ ডলারের উপর যেকোনও কেনাকাটার ক্ষেত্রে PIN থাকা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। আর এ ধরনের কেনাকাটার ক্ষেত্রে নগত লেনদেনও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৪. কালো টাকা প্রতিরোধে ভারতীয় রুপি নোট বাতিল পদক্ষেপঃ

ভারত সরকার সম্প্রতি কালো টাকার বিস্তার রোধে পুরোনো ৫০০ এবং ১০০০রুপি নোট বাতিলের ঘোষনা দিয়ে ব্যাংক হতে তার পরিবর্তে নতুন ৫০০ ও ১০০০রুপি নোট সংগ্রহের ঘোষনা দেয়, অন্যথায় সকল পুরাতন নোট বাতিল বলে গন্য হবে। শর্ত থাকে যে, যেপরিমান পুরাতন নোট পরিবর্তনের জন্য আনা হবে তার আয়ের বৈধ দলিল-দস্তাবেজ ব্যাংকে উপস্থাপন করতে হবে। এতে করে ঐ সয়কালের মধ্যে অনেকেই এর হিসেব দিতে পারে নাই এবং পুরোনো ৫০০ এবং ১০০০রুপির অগনিত নোট বাতিল হয়ে যায়। এভাবে ইন্ডিয়া সরকার অপ্রদর্শিত অর্থ বা কালো টাকার বিস্তার রোধে একটি কার্যকর ভুমিকা রাখে।

ছ. পাচার করা অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনা কি সম্ভব ?

দেশের প্রচলিত মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন বন্ধে বাংলাদেশসহ ১৪৭টি দেশ আন্তর্জাতিক সংস্থা "এগমন্ট গ্রুপ" এর সাথে জুলাই ২০১৩-এ চুক্তি সম্পাদন করায় এই পাচার করা অর্থের তথ্য পাওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে বাংলাদেশকেও সুইজারল্যান্ড-এর সাথে অর্থ পাচার সংক্রান্ত তথ্য আদান প্রদানের চুক্তি করতে হবে। আন্তর্জাতিক মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে "Financial Action Taskforce (FAT)" এর আওতায় "Asia-Pacific Group on Money Laundering" এগমন্ট গ্রুপ-এর আওতায় বিভিন্ন দেশকে পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করে। বাংলাদেশ ব্যাংক ও দুদক নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করলে এই পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হবে। তাছাড়া জাতিসংঘ দুর্নীতি বিরোধী আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করায় বাংলাদেশ সকল প্রকার দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত কালো টাকার উৎস বন্ধ এবং সুইস ব্যাংক সহ 'কর-স্বর্গ' বলে পরিচিত বিভিন্ন দেশ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত সকল অবৈধ অর্থ উদ্ধারে সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক, এনবিআর এবং দুদকের দায়বদ্ধতা রয়েছে।

জ. ক্রমবর্ধমান ঋণ খেলাপী ব্যাংকিং সেক্টরে অস্থিরতা ও বিনিয়োগ সংকট তৈরি করছে

ব্যাংকিং সেক্টরে চলছে এধরনের অরাজকতা। তথাকথিত অভিজাত লুটেরারা জনগণের সঞ্চিত সম্পদ লুটপাট ও রাষ্ট্রীয় অর্থ বিদেশে পাচার করে চলছে। শুধু সরকারি ব্যাংকগুলো হতে আনুমানিক ২০ হাজার কোটি টাকা লুটপাটের অভিযোগ রয়েছে। সরকার ঋন খেলাপীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেয়ার পরও দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপী ঋন ফি-বছর বেড়েই চলেছে। গত সেপ্টেম্বর'১৯ শেষে এর পরিমান ছিল ১,১৬,৮৮২ কোটি টাকা যা গত ২০১১ এর তুলনায় ৪১৬% বেশি।

এর সাথে পাল্লা দিয়ে মন্দঋনও রিসিডিউল বা নিয়মিতকরন করা হচ্ছে। গত জুন'১৯ শেষে রেকর্ড পরিমান মন্দঋন নিয়মিতকরন করা হয় যার পরিমান ছিল ৫০,১৮৬ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তি বছরের (২০১৮ সালে ২৩,২১০ কোটি) তুলনায় ১১৬% বেশি। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এর মতে গত জুন'১৯ মাস পর্যন্ত খেলাপি ঋণের পরিমান ছিল ১,১২,৪৩০ কোটি টাকা। এসব ঋণের পেছনে রাঘোব-বোয়ালদের হাত থাকায় এর আদায় যথাযথ ভাবে হচ্ছেনা এবং বারবার পুন:তফসিল করে এর সুযোগ নেয়া হচ্ছে। [প্রথম আলে, ০২/১২/২০১৯]

ব্যাংক ব্যবস্থার অরাজকতার জন্য ব্যাংকের পরিচালকরাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দায়ী। বর্তমানে বেসরকারি ব্যাংকে একই পরিবার থেকে ৪জন পরিচালক থাকতে পারবে যা পূর্বে ২জন ছিল এবং ১জন ব্যক্তি টানা ৩ মেয়াদে ৯ বছর পরিচালক হিসেবে থাকতে পারবে যা পূর্বে ৩ বছর করে পর পর ২মেয়াদে ৬ বছর পরিচালক থাকতে পারতো। নতুন নিয়মে ৩ বছর বিরতি দিয়ে আবারও ৯ বছর পরিচালক হবার বিধান রয়েছে। এর ফলে ব্যাংকগুলোতে পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সুশাসনের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। পরিচালকরা নিজেদের স্বার্থে নিজেদের মধ্যে আতাত করে একের পর এক গণবিরোধী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের আপত্তি সত্ত্বেও বর্তমান সরকার কার স্বার্থে এই আইন পাশ করলো। [সমকাল, ০৯/০৫/২০১৭]

ঝ. নতুন ব্যক্তি আয়কর নীতিমালায় অতি ধনীরা লাভবান হচ্ছে

কালো টাকা যেমন সাদা করার সুযোগ দেয়া হয়েছে তেমনি ধনীদের আয়করও ছাড় দেয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত নীতিমালায় ব্যক্তিশ্রেনির আয়করের ক্ষেত্রে একজন নিম্নবিত্তের কর কমবে ৫,০০০ টাকা আর অতি ধনীদের কমবে ২কোটি ৩৮ লাখ টাকা পর্যন্ত। যেখানে আয় বৈষম্য বাড়ছে, রাজস্ব আদায়ের পরিমান যথেষ্ট নয়, সরকারকে অর্থ যোগানের জন্য ব্যাংক ঋণের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে, অর্থপাচার বৃদ্ধি পাচ্ছে- সেখানে ধনীদের কর ছাড় কতটা যুক্তিযুক্ত ?

ঞ. বহুজাতিক কোম্পানী প্রকৃত কর দেয়না

১. বাংলাদেশে রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাপনার দুর্বল ভিত্তি ও অব্যবস্থাপনার সুযোগ নিয়ে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো বিভিন্ন পন্থায় কর গোপন করে আসছে। কোম্পানীগুলো এসকল অর্থ বিভিন্ন পন্থায় Transfer Pricing বা Profit Shifting এর মাধ্যমে তাদের প্রধান কার্যালয় বা তাদের অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলোতে বা করস্বর্গ নামে পরিচিত দেশে স্থানান্তর করে।

- ফোন কোম্পানীগুলো (গ্রামীণফোন, বাংলালিংক, এয়ারটেল ও রবি) ২০১১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত (৫বছরে) সিম বদলের নামে নতুন সিম বিক্রির মাধ্যমে প্রায় ১ হাজার ২০০ কোটি টাকার ভ্যাট ফাঁকি

দেয়। এর আগে ২০০৭ থেকে ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত একইভাবে ৩,১০০ কোটি টাকা ফাঁকি দেয়া হয়। [ইত্তেফাক, ১১/০৪/২০১৭]

- "ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিঃ (বিএটিবি)" যুক্তরাজ্যে অবস্থিত বিএটি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডকে কারিগরি ও পরামর্শ সেবার নামে ট্রান্সফার প্রাইসিংয়ের মাধ্যমে বিগত ৯ বছরে প্রায় ৬১৫ কোটি টাকার বেশি সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা পরিশোধ করে যা বছরে গড়ে প্রায় ৭০ কোটি টাকা। বিএটিবির নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৫ সালে কারিগরি ও পরামর্শ ফির সেবামূল্য দাঁড়িয়েছে ৯৭.৮১ কোটি টাকা। এছাড়া কোম্পানীটি তাদের দু'টি ব্র্যান্ডের সিগারেটে মূল্য স্তরে মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে ১,৯২৪ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি দেয়। [বণিকবার্তা, ১৩/১১/২০১৬]

২. অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ কর্তৃক এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বিনিয়োগের সুযোগ নিয়ে বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ২০১৩ সালে ৮ কোটি ৫৩ লাখ ডলার বা ৭০০ কোটি টাকা কর কম দিয়েছে। ১৮টি দ্বিপক্ষীয় 'অপচুক্তি'র মাধ্যমে বিশ্বের ১৫টি দেশের প্রতিষ্ঠান এ দেশ থেকে এই টাকা নিয়ে গেছে। ১৫টি দেশের কোম্পানিগুলোর মধ্যে যুক্তরাজ্যের কোম্পানিগুলোই সবচেয়ে বেশি ১কোটি ৪৫ লাখ ডলার কর কম দিয়েছে। আর যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলো ১কোটি ১৫লাখ এবং কোরিয়ার কোম্পানিগুলো ১কোটি ৩ লাখ ডলার কম দিয়েছে। মূলত এসব দেশের সঙ্গে সম্পাদিত দ্বৈতকর অব্যাহতি চুক্তিগুলোতে এমন শর্ত থাকে যেখানে কম কর দিয়ে বিদেশি কোম্পানিগুলো মুনাফা নিয়ে যেতে পারে। বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশেই সর্বোচ্চ ১৮টি অপচুক্তি আছে এবং বেশি কর দেওয়া হচ্ছে। রাজস্ব ক্ষতির এই অর্থ দিয়ে (৭০০ কোটি টাকা) এদেশে প্রতিবছর ৩৪ লাখ মানুষের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা যেত। *[প্রথম আলো: ২৯/০৫/২০১৬]*

ট. আমাদের প্রস্তাবনা

১. ব্যাংক লুট, অর্থপাচার, দুর্নীতি ও চোরাচালান রোধে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে। আইনগত শাস্তির বিধান রেখে হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাচার বন্ধ করতে হবে। সরকার প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র সকল পর্যায়ে প্রয়োগ করতে হবে।

২. দুদক ও এনবিআর-এ দক্ষ জনবল তৈরি, প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও শক্তিশালীভাবে কাজ কার করার সুযোগ দিতে হবে। ডিজিটাল বা অটোমেশন পদ্ধতিতে রাজস্ব আদায় করতে হবে।

৩. ব্যাংক ও আর্থিক খাত নিয়ন্ত্রনে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে স্বাধীন ও শক্তিশালী করতে হবে। ব্যাংক গুলোকে পরিবারতন্ত্র মুক্ত করতে হবে এবং এক পরিবার থেকে একজন পরিচালক রাখার দাবি জানাই। ব্যাংকগুলোকে বাঁচাতে শক্তিশালী, নিরপেক্ষ ও প্রভাবমুক্ত ব্যাংক সংস্কার কমিশন চাই।

৪. অর্থ পাচার রোধে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের বাজার মূল্য যাচাইয়ের জন্য আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন সেল থাকতে হবে। যাতে করে ঋণ পত্রে উল্লেখিত মূল্যের সাথে প্রকৃত বাজার মূল্য যাচাই করা যায়।

৫. বহুজাতিক কোম্পানি গুলো বিভিন্ন পন্থায় প্রকৃত আয় গোপন করে বিশেষ করে মিস ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে বিদেশে অর্থ স্থানান্তর করে থাকে। এই কোম্পানি গুলো দেশে কত টাকা বিনিয়োগ বা আয়-ব্যয়ের করলো তা কঠোর ভাবে ও নিয়মিত ভাবে মনিটরিং কারর জন্য বিশেষ সেল গঠন করতে হবে। পাশাপাশি এদের অডিট রিপোর্ট জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে।

৬. বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) এর সঙ্গে অন্য দেশের ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের চুক্তিও আছে, তাই কারা কত টাকা পাচার করল তার বের করে এর শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে।

৭. বিভিন্ন দেশের সাথে তথ্য আদান প্রদান ও ব্যাংক লেনদেনের স্বচ্ছতার উপর আন্ত-দেশীয় চুক্তি সম্পাদন করতে হবে এবং পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনার আইনগত ব্যবস্থা শুরু করতে হবে।

৮. সরকারের আভ্যন্তরীন নিরীক্ষা জোড়দার করতে হবে এবং পূর্বের নিরীক্ষায় প্রাপ্ত অনিয়মের বিপরীতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

৯. করোনা ভাইরাসের কারনে সরকার যেহেতু কাম্য রাজস্ব আদায় করতে পারছেনা এবং ব্যাপক হারে ব্যাংক ঋণের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে, তাই জাতীয় স্বার্থে সরকারের উচিত সরকারি অনুন্নয়ন ব্যয় পুন:পর্যলোচনা করে বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বন্ধ করা।

১০. বেনামী সম্পদ কেনা বন্ধ করার জন্য ভারতের পথ অনুসরণ করে আইন প্রণয়ন করতে হবে। যেমন, ২০০০ ডলারের উপর যেকোনও কেনাকাটার PIN ব্যবহার এবং এ ক্ষেত্রে নগদ লেনদেনও নিষিদ্ধ করা। ধরা পড়লে বেনামী সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা।

১১. বাংলাদেশী নাগরিকদের বা কোন দ্বৈত নাগরিকত্ব সম্পন্ন বাংলাদেশীদের বিদেশে সম্পদ ও ব্যাংক একাউন্ট থাকলে তাকে ফি-বছর বিবরণী বাংলাদেশে দিতে হবে। তথ্য গোপন ও কর ফাঁকি দিলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

১২. রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি ব্যাংকসহ শেয়ার বাজার কেলেংকারির আত্মসাৎকৃত টাকা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির উপর শ্বেতপত্র প্রকাশসহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩. পানামা পেপারস-এ যেসকল বাংলাদেশীদের নামে অর্থ পচারের অভিযোগ এসেছে এবং মালয়েশিয়া, কানাডা সহ বিভিন্ন দেশে যেসকল বাংলাদেশি নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে তাদের সকলের অর্থনৈতিক তথ্য পরীক্ষা করে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে।

সচিবালয়: ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি: ১৩ (মেট্রো মেলোডি), রোড়: ২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: ৮৮-০২-৫৮১৫০০৮২/৯১২০৩৫৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৯৩৯৫, ই মেইল: info@equitybd.net, ওয়েব: www.equitybd.net